আগামী প্রজন্মের ঢাকাঃ আমাদের করণীয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নগরের সক্ষমতা

পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ আমিনুর রহমান
পরিকল্পনাবিদ মোঃ শাহিনুর রহমান
পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ মুরাদ বিল্লাহ
পরিকল্পনাবিদ বায়েস আহমেদ
পরিকল্পনাবিদ রাশেদ জালাল হিমেল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নগরের সক্ষমতা

ভূমিকা

ঢাকা, বাংলাদেশেররাজধানীহওয়াতে,এদেশের সর্বাধিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন একটি মহা-নগরে পরিণত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন যাপনের নিশ্চয়তা, ভাল বেতনের চাকরি, আধুনিক মানের শিক্ষা, এবং চিকিৎসার আশায় প্রায়প্রতিদিনইবাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তথেকেশত-হাজারো মানুষ ঢাকায় ছুটে আসছেন। এভাবেই ঢাকা বর্তমানে হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র।

ঢাকা শহর বলতেই বর্তমানে আমাদের সামনে ভেসে ওঠে ট্রাফিক জ্যামে অনড়, বায়ু দূষণে অতিষ্ঠ, এবং সুউচ্চ ভবনে পরিবেষ্টিত একটি কনক্রিট জঙ্গলের চিত্র। অতিরিক্ত মানুষের চাপে ঢাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব যেমন মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে উঠেছে, তেমনি পর্যায়ক্রমে ঢাকাশহরের বসবাসযোগ্যতা হ্রাস পাচ্ছে। এরকম হাজারো সমস্যার মাঝে, নানাবিধ প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ঢাকার দৈনন্দিন জনজীবনকে করে তুলছে আরও বেশি দুর্বিষহ।

দিনে দিনে ঢাকায় শুধুমাত্র উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত কর্মজীবী মানুষের সংখ্যাই বাড়ছে না, একই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অতি-নিম্নবিত্ত মানুষের ঢল। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে নিম্নবিত্ত মানুষদের পর্যাপ্ত আবাসনের কোন ব্যবস্থা না থাকায়, এই সকল খেটে-খাওয়া মানুষ বাধ্য হয়ে বসবাস করছেন অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে। যেমন অনেকেই বসবাস করছেন হাজারীবাগ ট্যানারির বস্তিগুলোতে। অনেকেই আবার থাকছেন মহাখালীর কড়াইল কিংবা বুড়িগঙ্গা নদীর আশেপাশের বস্তিতে। এভাবে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য অবৈধ বস্তি। এসকল বস্তিতে চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করে, যার ফলে প্রায় প্রতিনিয়তই বস্তিবাসীরা নানা রকম অসুখের সম্মুখীন হন। অনেক পানিবাহিত রোগ আবার মহামারি আকারে ছড়িয়ে পরে, যা একধরনের নগর দুর্যোগ।আবার অনেক বস্তিতে প্রায়ই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে থাকে এবং এতে করে অনেক সম্পদ ও প্রাণহানি হয়। এছাড়াও মহাখালি এবং মগবাজারের মতো ঢাকার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে রেল-লাইনের কিনার ঘেঁষে গড়ে ওঠা বস্তির মানুষ মাঝে মাঝেই রেলের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যাচ্ছেন।

ঢাকা এবং আশপাশের জলাভূমিসমূহ ভরাট করে গড়ে উঠছে অপরিকল্পিত আবাসন। ঢাকার বেশিরভাগ এলাকায় পর্যাপ্ত নালা-নর্দমা না থাকায়, অতি সামান্য বৃষ্টিতেই তলিয়ে যাচ্ছে ঢাকা শহর। এছাড়াও প্রায় প্রতি দশকেই ঢাকা ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এর ফলে শহরে বসবাসরত সকল শ্রেণীর মানুষ নানা সমস্যায় পতিত হচ্ছেন। বিশেষভাবে আক্রান্ত হচ্ছেনযারা ঢাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধগুলোর ধারে বসবাস করছেন। তাই বর্ষাকালের বন্যা বা জলাবদ্ধতা ঢাকার অন্যতম একটি প্রধান দুর্যোগ হিসাবে গণ্য হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ঢাকায় এবং এর আশেপাশে হাজারো গার্মেন্টস এবং অন্যান্য শিল্প গড়ে ওঠায় সংশ্লিষ্ট দুর্যোগপ্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন গার্মেন্টস শিল্প-কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে হতাহত হওয়ার ঘটনা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। পুরানো ঢাকার প্লাস্টিক এবং অন্যান্য কারখানায় স্বাস্থ্যঝুঁকিও দুর্যোগের সামিল। আরও রয়েছে ত্রুটিপূর্ণ প্রকৌশলগত কাঠামো নকশা এবং নির্মাণকালীন অনিয়মের কারণে ভবনধ্বস, যা ব্যাপকভাবে একটি প্রাণহানিকর দুর্যোগে পরিণত হয়েছে।

ঢাকায় মাঝে মধ্যে মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়, এর ফলে বেশ কিছু বাড়িতে ফাটল দেখা যায়; এর বাইরে আজ পর্যন্ত ভূমিকম্পের কারণে বড় ধরনের কোন দুর্যোগ হয় নাই। যদিও বিভিন্ন গবেষণায়, ঢাকার অবস্থান ভূমিকম্পপ্রবন এলাকায় দেখানো হচ্ছে; কিন্তু এই দুর্যোগের ভয়াবহতা নিয়ে কার্যকরী কোন পদক্ষেপনেয়া হচ্ছে না।অতিরিক্ত ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকা শহর ভবিষ্যতের দিনগুলিতে ভূমিকম্প দুর্যোগের সম্মুখীন হতে পারে, তাই এই বিষয়ে সতর্কতা জরুরি। এছাড়া জলাভূমি ভরাট, ব্যাপকভাবে গাছপালা নিধন, অপরিকল্পিত নগরায়ন, এবং বিটুমিন-কনক্রিটের মাত্রাতিরিক্ত

ব্যবহারের কারণে ঢাকাবাসী গ্রীষ্মকালে অপ্রত্যাশিত তাপদাহের সম্মুখীন হচ্ছেন। ইহাও একটি নতুন ধরণের মানবসৃষ্ট দুর্যোগ। আরও রয়েছে গ্রীষ্মকালে বিশুদ্ধ পানির স্বল্পতা, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, এবং প্রতিনিয়ত নানাবিধ নিত্য-নতুন দুর্যোগের সম্ভাবনা।

এমনি বিবিধ দুর্যোগের কারণে ঢাকাবাসীর দৈনন্দিন জীবনের নিরাপত্তা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে এবং একই সাথে জীবন যাত্রার মান নিম্নতর হচ্ছে। সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলোকে যদি আশু লাঘব করা না যায়, তবে তা সহসায় ব্যাপক দুর্যোগ আকারে দেখা দিতে পারে এবং নগরবাসীর জীবনে বয়ে আনতে পারে চরম দুর্ভোগ। তাই সাম্প্রতিককালের ঢাকা শহরের এসকল দুর্যোগকে মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। এমন একটি অবস্থান থেকে ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স ও সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট কম্যুনিকেশন যৌথউদ্যোগে 'আগামীপ্রজন্মেরঢাকাঃআমাদেরকরণীয়' শীর্ষক গবেষণা ভিত্তিকপ্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রকাশনার আওতায় ১০টি বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, যার একটি হল - 'দুর্যোগব্যবস্থাপনাও নগরের সক্ষমতা'। এই থিমের অধীনে ঢাকা শহরের দুর্যোগের প্রস্তুতি, দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে বিশদ সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হবে।

একটি নগরের সাপেক্ষে 'দুর্যোগ' শব্দটি অনেক ব্যাপক এবং বিস্তৃত। এর আওতায় স্বল্প মেয়াদের জলাবদ্ধতা থেকে শুরু করে স্থান করে নিতে পারে পরিবেশ দূষণের মতো দীর্ঘ মেয়াদি কারণে ঘটে যাওয়া স্বাস্থ্যঝুঁকি।এছাড়াও ঢাকায় নানাবিধ দুর্যোগের প্রকোপ দেখা যায়। এমতাবস্থায় বিবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে, শুধুমাত্র বিগত ৩ দশকের সময়কালে ঘটে যাওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ দুর্যোগগুলোকেই এই গবেষণার আওতায় আনা হয়েছে। এগুলো হলঃ বন্যা-জলাবদ্ধতা, অগ্নিকাণ্ড, ভবন-ধ্বস, এবং ভূমিকম্প।

বন্যা ও জলাবদ্ধতা

বিগত ৩০ বছরে ঢাকা কমপক্ষে ৫ টি বড় বন্যার সম্মুখিন হয়েছে যার মধ্যে ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০৪ এর বন্যার মাত্রা ও ব্যাপকতা ছিল ভয়াবহ। ১৯৮৮ সালের বন্যার পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঢাকা শহরের একটি অংশ(ঢাকা পশ্চিম - ১৪৩ বর্গকিমি)নদীর বন্যা থেকে রক্ষা করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, ১৯৯৮ সালে এসেও তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যায়নি। ১৯৯৮ সালে ঢাকার পশ্চিম অংশে বন্যার মূল কারণই ছিল সুরক্ষা কাঠামোর (protection work)অসম্পূর্ণ অংশ দিয়ে বন্যার পানি অনুপ্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর (control structure)ব্যর্থতা।১৯৯৮ সালের পর ঢাকা পশ্চিমনদীর বন্যা নিয়ন্ত্রনের আওতায় আনা হয়। তারপরও ২০০৪ সালের বন্যা বৃষ্টির পানিতেসৃষ্ট জলাবদ্ধতা বা অভ্যন্তরীণ বন্যার (internal flood) বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে সামনে নিয়ে আসে। সাম্প্রতিকবছরগুলোতে বর্ষাকালেবৃষ্টির পানিতেসৃষ্ট এই ধরনের জলাবদ্ধতা বা অভ্যন্তরীণ বন্যাপুরো ঢাকারজন্যই একটিনিয়মিত ও প্রকট সমস্যাহিসেবেদেখাদিয়েছে। এ ধরনের সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রনের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নও অপরিহার্য।

আসলে ঢাকার মত দ্রুত বর্ধনশীল একটি শহরের জন্য যে ধরনের নিষ্কাশনব্যবস্থাএবংদক্ষব্যবস্থাপনা থাকা দরকার সময়ের সাথে তা পর্যাপ্তভাবে গড়ে ওঠেনি। এখনও শহরের একটি বড় অংশ (ঢাকা পূর্ব - ১১৯ বর্গকিমি) নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রনের আওতায়আনা যায়নি। অন্যদিকে নদী, খাল ও জলাভূমি, যা কিনা প্রাকৃতিকনিষ্কাশনব্যবস্থার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অবৈধভাবে দখল করে ইমারত ও অবকাঠামো নির্মাণ করায় বৃষ্টির পানির স্বাভাবিক গতিপথ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের অনেক এলাকা দীর্ঘ সময়ের জন্য জলাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। বর্তমান নিষ্কাশন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা (প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত) এবং অদক্ষতার (কঠিন বর্জ্যের কারণে হ্রাসপ্রাপ্ত বহন ক্ষমতা –reduced carrying capacity) পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিজেদের মধ্যে সমন্বয়হীনতাও অনেক সময় জলাবদ্ধতার সমস্যাকে প্রলম্বিত করছে।

বন্যা-জলাবদ্ধতার কারণে সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করা দুরূহ হলেও রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক জীবনে এর সর্বব্যাপী প্রভাব নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো থেকে অনুধাবন করা যায়ঃ

- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত
- যানযট, চলাচলেসমস্যা ও দুর্ঘটনা
- গাছপালা, রাস্তা, ইমারত ও অবকাঠামোর ক্ষতি
- ভূগর্ভস্থ সেবা লাইনের ক্ষতি
- পানি দূষণ এবং পানি বাহিত রোগ, মশার সমস্যা
- নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বৃদ্ধি, ইত্যাদি।

বন্যা ও জলাবদ্ধতার প্রকোপ লাঘবে নিচের সুপারিশগুলো বিবেচনা করা দরকার:

- নদী, খাল ও জলাভূমির অবৈধ দখল ও ভরাট ঠেকাতে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে ঢাকা মেট্রপলিটান ডেভলপমেন্ট প্লান (ডিএমডিপি) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা অনুসরণ করা খুবই জরুরি।
- বৃষ্টির পানির সর্বোচ্চপ্রবাহ (peak flow) হ্রাসকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন–permeableফুটপাথ তৈরি করা, সম্ভব হলে বৃষ্টির পানি বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে সরাসরি ড্রেনে না ফেলে কিছু সময়ের জন্য ধরে রেখে প্রথমে উম্মুক্ত স্থানে ফেলা (rooftop disconnection), বৃষ্টির পানি ধরে রেখে পরে ব্যবহার করা (rain water harvesting),

ইত্যাদি। বড় আকারে বাস্তবায়নের আগে ঢাকার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র পরিসরে এ ধরনের পদ্ধতিগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাই করা দরকার।

- বর্ষাকালে অবকাঠামো (রাস্তা, ড্রেন, ইত্যাদি) নির্মাণ ও সংস্কার রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের(ঢাকা ওয়াসা, ডিসিসি, রাজউক, বিডব্লিউডিবি, ইত্যাদি) প্রতিনিধিসহ জনগণ সম্পৃক্ত(ওয়ার্ড ভিত্তিক) তদারকি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।
- নিয়মিত ড্রেন পরিস্কারের ব্যবস্থা করা।
- যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলা রোধ করার জন্য জনগণকে সচেতন করা। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এনজিও ও প্রচার মাধ্যম গুলোরও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়।
- বন্যা ব্যবস্থাপনা ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্যবাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। অর্থায়ন ও নিজস্ব সামর্থ্যের কথা বিবেচনায় রেখে, অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে ধাপে ধাপে (incremental) পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

অপরিকল্পিত উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়নের অভাব, আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকা এবং সামগ্রিকভাবে জনসচেতনতার অভাবই ঢাকার জলাবদ্ধতার মত মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মুল কারণ হিসেবে প্রতীয়মান।ভবিষ্যৎ ঢাকার জন্য জলাভূমিগুলো রক্ষা করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য আবাসনসহ অন্যান্য সুযোগসুবিধার যোগান দেয়া। একটি দীর্ঘমেয়াদি, ভারসাম্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নই পারে ঢাকাকে জলাবদ্ধতার মত সমস্যা থেকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করতে। এজন্যরাজনৈতিক অঙ্গীকারের পাশাপাশি জনসাধারণের সচেতনতা ও সক্রিয় সম্পৃক্ততাও খুবই প্রয়োজনীয়।

ভবন-ধ্বস

ভবন ধ্বস ভুমিকম্প, ভূমিধ্বস বা সুনামির মত দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট একটি দুর্যোগ বলে বিবেচিত হলেও বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে ভবন ধ্বস এককভাবেই একটি দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ১৯৯৬ সালে কলাবাগানের সাত (৭) তলা ভবন, ২০০৫ সালে আট (৮) তলা স্পেক্ট্রাম গার্মেন্টস ভবন, ২০০৬ সালে তেজগাঁওয়ের ফিনিক্স ভবন ধ্বসে পড়ার ঘটনা আমাদের সকলেরই জানা। সর্বশেষ ২০১৩ সালের ২৪শে এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধ্বস এবং এর ফলে ১১০০ এর বেশি মানুষের মৃত্যু ভবন ধ্বসকে একটি জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে বিবেচনায় আনার কথা ভাবিয়ে তুলেছে।

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে এখানে সেখানে ভবন হেলে পড়ার ঘটনাও অনেক। এর মধ্যে বেগুনবাড়ির সাত (৭) তলা ভবন এবং পুর্ব নাখাল পাড়ার চার (৪) তলা ভবন হেলে পড়ার ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রতিটি ভবনধ্বস কিংবা হেলে পড়ার ঘটনা বিশ্লেষণ করলে তিনটি কারণ উল্লেখযোগ্যভাবে বিবেচনায় চলে আসে।

১। ভবন নির্মানের স্থান;

২। নির্মান প্রক্রিয়া এবং নির্মান সামগ্রীর গুণগত মাণ;

৩। ভবনের ব্যবহার

অধিকাংশ ভবনধ্বসের পেছনেই নির্মানের স্থানটির মাটির ভর ধারণক্ষমতার (Load Bearing Capacity) দুর্বলতার চিত্র উঠে এসেছে। অর্থাৎ, নির্মানের স্থানটি পূর্বে ডোবা, পুকুর কিংবা বর্জ্য ফেলার স্থান হিসেবে ব্যবহার হয়েছিল বলে জানা যায়। আবার ফিনিক্স ভবন এবং রানা প্লাজার ক্ষেত্রে নির্মান এবং নির্মান সামগ্রীর ত্রুটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সর্বশেষ রানা প্লাজা ধ্বসের অন্যতম আরেকটি কারন বসবাসের নিমিত্তে তৈরি করা ভবনে শিল্পকারখানা স্থাপন। আর এই সব বিষয় একত্রে বিবেচনায় নিলে দেখা যায় যে অবৈধভাবে, অনুমোদনের ব্যাত্যয় ঘটিয়ে এবং বিধিমালা না মেনে ভবন নির্মানই মূল কারন।

উপরেউল্লেখিত বিষয়গুলোকে সার্বিকভাবে বিবেচনায় নিয়ে ভবনধ্বসের মত দুর্যোগ প্রতিরোধের সক্ষমতা গড়ে তুলতে যে সকল বিষয়গুলি বিবেচনা করা প্রয়জন তা হলোঃ

ক। ভবন নির্মানের পূর্বে নির্মানের স্থান সম্পর্কে সঠিক ধারনা থাকা বাঞ্চনীয়। ডোবা, নালা, পুকুর, বর্জ্য ফেলার স্থান কিংবা এরূপ স্থান যেখানে মাটির নিচের পানির স্তর খুব গভীরে নয় সে সকল যায়গায় যথা সম্ভব ভবন নির্মান না করা। যদি একান্তই সে সকল স্থানে ভবন নির্মান করতে হয় তবে যথাযত ভাবে তা ভবন নির্মানের উপযোগী করে তুলতে হবে এবং সে সকল স্থানে কেবল বসবাসের উপযোগী ভবন নির্মান করতে হবে। শিল্প কিংবা বাণিজ্যিক ভবন নির্মান একেবারেই অনুচিত।

খ। যে কোন স্থানে ভবন নির্মানের ক্ষেত্রে যথাযতভাবে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন করা এবং তদুনাযায়ী ভবন নির্মান করা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন অনুযায়ী ভবনের ভিত্তিস্থাপন এবং ভিত্তির উপরে নির্মিত কাঠামো যথাযত হতে হবে।

গ। ভবন নির্মানের ক্ষেত্রে দক্ষ প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে দক্ষ নির্মানশ্রমিক দ্বারা নির্মান কাজ পরিচালনা করতে হবে যাতে করে নির্মানের গুণগত মাণ বজায় থাকে। এক্ষেত্রে নির্মান সামগ্রীর গুণগত মাণ বজায় রাখাও জরুরী। প্রয়োজনে নির্মান সামগ্রীর মাণ যথাযত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে তারপর ব্যবহার করা যেতে পারে। যত ভালো প্রকৌশলী দ্বারাই ভবনের নকশা করা এবং নির্মান কাজ পরিচালনা করা হোক না কেন নির্মানের সময় নির্মান সামগ্রীর গুণগত মাণ নিশ্চিত করা না গেলে তাও ভবনধ্বসের কারন হয়ে দেখা দিতে পারে।

ঘ। ভবনধ্বসের মত দুর্যোগ প্রতিরোধে ঢাকা শহরের পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সাথে জড়িত সংস্থা সমূহের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন পরিকল্পনায় উল্লেখিত যথাযত স্থানে ভবন নির্মান হচ্ছে কিনা, ভবন নির্মানে দক্ষ্য প্রকৌশলী তদারকি করছেন কিনা, নির্মানের গুনগত মান ঠিক আছে কিনা এবং ভবনের ব্যবহার সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদারকি করা বাঞ্ছনীয়। এর জন্য প্রয়োজন এর সাথে সংশ্লিষ্ঠ সকল সংস্থার দক্ষ্য জনবল বৃদ্ধি এবং এর পাশাপাশি তাদের দক্ষ্যতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়াও জরুরী।

ঙ। সংশ্লিষ্ঠ সংস্থা ভবনের স্থান এবং নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে যথাযত প্রক্রিয়া মেনে চলতে হবে। পরিকল্পনায় উল্লেখিত বিষয়গুলোর ব্যাত্যয় ঘটানো কোনক্রমেই কাম্য নয়।

বাংলাদেশে ভবনের অগনিত নিরাপত্তা থেকে শুরু করে ভবনের নকশা প্রনয়ন, নির্মাণ ও ব্যবহার এর কথা বিবেচনায় এনে বহু জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড প্রথম প্রকাশিত হয় যা পুনর্বিবেচনা করে ২০০৬ সালে পুনরায় প্রকাশিত হয়। এরকম একটি গুরুত্বপুর্ণ বিধিমালা প্রকাশের ২০ বছর পরেও এর প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে নিশ্চিত করা যাচ্ছেনা। তদুপরি ২০০৫ সালে স্পেক্ট্রাম গার্মেন্টস এবং ২০০৬ সালে ফিনিক্স ভবন ধ্বসের পর তৎকালীন সংসদে বিল্ডিং কোড না মানার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে একটি আইনও প্রনয়ন করা হয়েছিল। সে আইনে বলা আছে যে, যদি সংশ্লিষ্ঠ কেউ বিল্ডিং কোডের অংশবিশেষও সঠিক ভাবে মানতে ব্যর্থ হন তাহলে তিনি কমপক্ষে সাত (৭) বছরের জেল অথবা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। এরকম একটি কঠিন আইন থাকা সত্যেও বিল্ডিং কোড না মেনে চলা একেবারেই কাম্য নয়। আর এর সঠিক বাস্তবায়নে দরকার সরকার, সংশ্লিষ্ঠ সংস্থা এবং ব্যাক্তি পর্যায়ে বিল্ডিং কোড মেনে চলার নৈতিক সচেতনতা।

অগ্নিকান্ড

ঢাকা শহরে প্রায় প্রতিদিনই কোথাওনা কোথাও অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটছে। ছোটখাট এসব অগ্নিকান্ডের পাশাপাশি বৃহৎ আকারের অগ্নিকান্ডের ঘটনাও ইদানীং বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া পুরনো ঢাকার নিমতলী অগ্নিকান্ড এবং সাভারের তাজরীন গার্মেন্টসের অগ্নিকান্ডের প্রতিটিতে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর ঘটনা অগ্নিকান্ডকে ঢাকার জন্য একটি বড় দুর্যোগ হিসেবে প্রতীয়মান করেছে।

দুর্যোগ হিসেবে অগ্নিকান্ডকে ঢাকা শহরের প্রেক্ষাপটে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ

- শিল্প কারখানায় অগ্নিকান্ড
- বহুতল বাণিজ্যিক ভবনে অগ্নিকান্ড
- আবাসিক ভবন ও বস্তিতে অগ্নিকান্ড

এই তিন ধরনের অগ্নিকান্ডেরই মূল কারণ বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট। পাশাপাশি, রান্না ঘরের চুলা থেকে অগ্নিকান্ডের ঘটনাও ঘটছে। অগ্নিকান্ডের কারণে ব্যাপক জীবন ও সম্পদহানি ঘটে। তদুপরি, অগ্নিকান্ডে আহতদের চিকিৎসা জটিল, ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ এবং চিকিৎসাব্যবস্থা অপ্রতুল হওয়ায় অগ্নিকান্ড প্রতিরোধের বিকল্প নেই।

নগর পরিকল্পনার মূলনীতি অনুসরন করে নগরের উন্নয়ন হলে অগ্নিকান্ডসহ অন্যান্য অনেক দুর্যোগের ঝুঁকিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমে যেত; কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে যেহেতু ঢাকা শহরেরক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি, তাই আমাদের ব্যাপকভাবে ঝুঁকি হ্রাসের সুযোগ কম; বরং আমাদের ভাবতে হচ্ছে দূর্যোগকালীন এবং দূর্যোগ-পরবর্তী সাড়া-প্রদানের ব্যাপারে করনীয় সম্পর্কে। তবে এই সীমাবদ্ধতার মাঝেও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ঝুঁকি হ্রাসের চেস্টার বিকল্প নেই।

নগর পরিকল্পনা ও দূর্যোগ ব্যাবস্থাপনার উদ্দেশ্যে যে সকল আইনানুগ কার্যবিধি তৈরী করা হয়েছে, বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগই অগ্নিকান্ড থেকে আমাদের নিরাপদ রাখতে পারে। এজন্য নতুন কোনো আইন-কানুন অপরিহার্য নয়।

নিম্নলিখিত সুপারিশমালা ঢাকা শহরের প্রেক্ষাপটে অগ্নিকান্ড সংক্রান্ত দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর হতে পারেঃ

- পর্যায়ক্রমে ঢাকা শহরের অপেক্ষাকৃত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে পোষাক- ও অন্যান্য শিল্পকারখানা সরিয়ে নেয়া যেতে পারে।
- পুরনো ঢাকাসহ ঢাকা শহরের যেসকল এলাকায় রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লিস্ট শিল্পস্থাপনা আছে, সেগুলো অপেক্ষাকৃত কম ঘনবসতিপূর্ণ অনাবাসিক এলাকায় সরিয়ে নেবার ব্যাবস্থা করা যেতে পারে।
- ব্যবহার নির্বিশেষে সবধরণের ভবনেই বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাকে অগ্নিকান্ড-নিরোধী করে স্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নমানের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সেজন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের মান নিয়ন্ত্রনের জন্য সংশ্লিস্ট প্রতিস্টানকে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।
- ব্যবহার নির্বিশেষে সবধরণের বহুতল ভবনেই আপদকালীন বহিঃর্গমন ব্যবস্থা (emergency exit) রাখতে হবে।
- আপদকালীন বহিঃর্গমন ব্যবস্থার কার্যকারীতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত মহড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

- ব্যবহার নির্বিশেষে সবধরণের ভবনেই ভবনের ব্যবহার অনুযায়ী (function-specific) (আবাসিক/বাণিজ্যিক/কারখানা) প্রয়োজনীয় অগ্নি-নির্বাপন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- অগ্নিকান্ডে সরাসরি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পাশাপাশি আগুন হতে সৃস্ট ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মানুষ মারা যায়। এ ব্যাপারটি মাথায় রেখে সকল ভবনেই অগ্নিকান্ডের সময় কি করণীয় সেটি নির্দেশিত থাকা উচিৎ। এক্ষেত্রে building-specific emergency plan তৈরী করে ভবন ব্যবহারকারীদের নিয়মিত মহড়ার আওতায় আনতে হবে।
- অগ্নিকান্ডের সময় আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের কাজে যেন অহেতুক বাঁধার সৃস্টি না হয়, সেজন্য পাড়া-ভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রম চালানো যেতে পারে।
- আগুন নেভআনোর জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে ঝুঁকি নিরূপণের (risk assessment) মাধ্যমে fire hydrant স্থাপনের জন্য strategic location নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- যেসকল এলাকায় ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি প্রবেশ করা কঠিন, সেসকল এলাকায় সরাসরি পানি সরবরাহের জন্য fixed water hydrant স্থাপন করা যেতে পারে (as in high-rise buildings)।

ভূমিকম্প

ঢাকা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র যা বিশ্বের সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ন শহর যেখানে এক কোটির বেশী লোকের বাসস্থান।ভৌগলিক ভাবে এই শহরের অবস্থান ভূমিকম্পে ঝুকিপ্রবন এলাকায় যেখানে পেন্সটের সংযুক্ত স্থলের খুব সন্নিকটে। ঐতিহাসিক ভাবে বড় বড় ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ ভূতাত্তিক জরিপ এর তথ্য থেকে জানা যায় ঢাকা শহরে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ছোট থেকে মাঝারী ধরনের ৫০০ এর বেশী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এখানে উলেস্নখ্য যে বিগত ১০০ বছরে ঢাকা শহরে কোন বড় ধরনের ভূমিকম্প সংঘটিত হয়নি, যার ফলশ্রুতিতে ভূমিকম্পের আঘাত আমাদের ঢাকা শহরে কত মারাত্বক হতে পারে তা হয়তো সাধারন দৃষ্টিকোন থেকে আমাদের কল্পনার অতীত।এক দিকে যেমন এই এলাকায় ভূমিকম্প হবার প্রবল সম্ভবনা রয়েছে, অন্যদিকে এই শহরের দুর্বল অবকাঠামো ঝুকিপূর্ন বাড়ী নির্মান,ঘনবসতি, সচেতনাতার প্রভার সেই সাথে দুর্বল ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা আমাদের প্রিয় শহর ঢাকা হয়েছে চরম ভাবে ঝুকিপূর্ন কিন্তু ২০০১ সালে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের গুজরাটে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের ভয়াভহতা থেকে আমাদের ভাবনাকে প্রসারিত করবে একথা অনস্বীকার্য যে কোন ভূমিকম্প প্রবন এলাকায় অনেক দিন ভূমিকম্প না হলে সেখানে পেন্সটের সংযোগস্থলে শক্তি জমাহয়ে বড় ভূমিকম্প হতে পারে। আমরা যদি বিশ্বের অন্যান্য উদাহরনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় শুধুমাত্র ভূমিকম্পের ঝুকি পরিমাপ করে পরিকল্পনার মাধ্যমে ঝুকি কমিয়ে ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়েছে। এখানে উলেস্নখ করার মতো যে হাইতি ভূমিকম্প ছিল ৭ মাত্রার যেখানে চিলির ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৮.৮। কিন্তু হাইতির ক্ষয়ক্ষতি ছিল চিলির ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় অনেক গুন বেশী। CDMP রিপোর্ট থেকে জানা যায় পেন্সটের সংযোগ স্থলে যদি ৮ মাত্রায় একটি ভূমিকম্প হয তা হলে ঢাকা শহরের ৮৩ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত্ব হবে যার মাঝে ৭৩ শতাংশ মেরামত অযোগ্য। ভবনের সাথে সাথে সুবিধা (পানি সরাবরাহ করা, বিদ্যালয়, গ্যাস সরাবরাহ ও অন্যান্য) ও ব্যবস্থা সমুহ ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং অনেক লোকের প্রাণ হানীর সম্ভবনা রয়েছে।তাই সংগত কারনে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে হলে আমাদেরকে এর ঝুকি নিরূপন করে তা কমিয়ে আনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে।

ভূমিকম্পের রোধে এবং ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য ঝুকিযুক্ত মহানগরী গড়ে তোলার জন্য আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী এবং সল্প মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে।

- ঢাকা শহরের জন্য ভূমিকম্পের জন্য ক্ষুদ্র এলাকা (Micro Zonation) মানচিত্র তৈরী করতে হবে। যেখানে উচ্চ মধ্য এবং নিম্ন ঝুকি চিহ্নিত করতে হবে। এই মানচিত্রের ভিত্তিকে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় আনতে হবে ফলে কি ধরনের ঝুকি এলাকায় কি ধরনের ভূমি ব্যবহার যোগ্য তা বিস্তারিত তুলে ধরতে হবে। ফলশ্রুতিতে ভবিষৎ শহরকে নিরাপদ এবং অন্যান্য বিপদ থেকে রক্ষা করা যাবে। অপর দিকে প্রতিটি ভূমিকম্প ক্ষুদ্র এলাকা (Micro Zonation) এর জন্য আলাদা আলাদা ভবন নির্মান কোড প্রস্তুত করতে হবে যাহাতে ভবিষৎ সব ধরনের ভবন কাঠামোগত ভাবে ঝুকি মুক্ত থাকে। সেই সাথে ভুমিকম্প প্রতিরোধক ভবন নির্মান এবং বর্তমানে ঝুকিপূর্ন ভবন রেষ্টিফিকেশন করা জরুরী।
- যখন কোন বড় ভূমিকম্প হয় সেখানে ফলশ্রুতিতে অন্যান্য দুর্যোগ ঘটে সেখানে অন্যান্য দুর্যোগ যেমন ভবন ধ্বস, আগুন শিল্প কারখানা ধ্বস সংঘঠিত হয় যা আমাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বাড়িয়ে দেয়। তাই ঝুকিপূর্ন ভারী শিল্পকে শহরের বাহিরে নেওয়া একটি জরুরী বিষয়।
- বর্তমান ভবনের জন্য কি করনীয় এ প্রশ্নটা প্রায়ই চলে আসে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান সব ভবনের ক্ষেত্রে ভূমিকম্প ঝুকি মূল্যায়ন করে ঝুকিপূর্ন ভবনের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। যে সকল ভবন মেরামত যোগ্য সে সকল ভবন মেরামত করতে হবে আর অমেরামত যোগ্য ভবনের বিভিন্ন মেয়াদে সময় দিয়ে সরিয়ে নেওযার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করা যেতে পারে।
- ভূমিকম্পে সহনশীল ভবন নির্মান স্থপতি প্রকৌশলী ও রাজমিস্ত্রীদের বিশেষ প্রশিক্ষানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- দূর্যোগ মুহূর্তে জরুরী ভিত্তিতে নিরাপদ স্থানে যাবার সঠিক পরিকল্পনা করতে হবে এ জন্য ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্থানে গুরুত্ব স্থান এবং অতিগুরুত্বপূর্ন সড়ক ব্যবস্থা নিরাপদ রাখতে পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।
- কাঠামোগত সমাধানের পাশাপাশি আমাদের অকাঠামোগত সমাধানের দিকে আগাতে হবে। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতিরোধে আমাদের সচেতনা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক ভাবে কাজ করে যেতে হবে। আমাদের কোন স্কুলেই এখনো দুর্যোগকালীন জরুরী অবস্থায় করনীয় সম্পর্কে কিছু শেখানো হয় না। তাই স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান দান করে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য মাঝে মাঝে ড্রিল করা যেতে পারে । এখানে একটা বিষয় লক্ষনীয় যে বাচ্চারা স্কুলে নতুন কিছু শিখলে বাড়ীতে বাবা-মাকে বলে এভাবে তাদের মাঝে ও সচতনা তৈরী হয়।

- জরুরী মহুর্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেমন হাসপাতাল, স্কুল, অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বাস ষ্টেশন, বিমান বন্দর সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন স্থান ঝুকি মুক্ত এলাকা গড়ে তুলতে হবে। সেইসাথে আমাদের শহরকে জরুরী মুহুর্তে শহরকে সচল রাখতে পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ, রাস্তা, ব্রিজ, এগুলোকে ভূমিকম্প সহনশীল করে গড়ে তুলতে হবে
- দুর্যোগ মুহুর্তে উদ্ধার কাজ চালানো, চিকিৎসা প্রদান এবং ত্রান পৌছে দেওয়ার জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেনী পেশায় মানুষকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক সেচ্ছাসেবী সংঠন গড়ে তুলে উদ্ধার কাজ সহ দুর্যোগপূর্ন মুহুর্তে ক্ষতি পুষিয়ে উঠার জন্য ইনসুরেন্স ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।
- বাংলাদেশের Standing Order for Disaster (SOD) রয়েছে তা অতিগুরুত্বপূর্ন যেখানে সুস্পট ভাবে বলা আছে দুর্যোগ মুহুর্তে কোন সংস্থার কি করনীয়। তাই (SOD) এর প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন এবং প্রয়োজনে পরিমার্জন করে বাৎসরিক ভাবে হালনাগাদ করে তৈরী করতে হবে। সেইসাথে সংস্থা সমুহের যোগাযোগ ও কার্যক্রম সচারু হওয়ার ব্যবস্থা করা।
- দুর্যোগকালে মানুষ যেন ভীত হয়ে না পড়ে সে জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বে সেইসাথে ভূমিকম্পের সময় কি করনীয় এসব বিষয়ে সাধারণ জনগনকে প্রশিক্ষিত ও সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনীয় ত্রান এবং ঔষধ সামগ্রী ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ঝুকিমুক্ত স্থানে জমা করে রাখা এবং এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য সেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষান প্রদান করতে হবে।

View publication stats